লেখাচুরি : গবেষকদের কর্তব্য ও নৈতিকতা

(Plagiarism : Responsibility and Ethics of Researchers)

ড. সন্তোষ কুমার তুঙ্গ

গ্রন্থাগারিক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

সার (Abstract) :

গবেষণার ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হল লেখাচুরি যাকে ইংরেজিতে Plagiarism বলা হয়। বর্তমান সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল লেখাচুরি বলতে কি বোঝায়, কত ধরনের লেখাচুরি হয় এবং লেখাচুরি প্রতিরোধ করার জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সেই বিষয়গুলির খুঁটিনাটি আলোচনা করা। গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থের বা বিভিন্ন তথ্য উৎসের সাহায্য নিতে হতে পারে কিন্তু উপযুক্ত স্থানে ঋণ স্বীকার করতে হবে। গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে লেখাচুরি অর্থাৎ উৎস স্বীকার না করে কপি করা বা টুকে দেওয়া উচিত নয়। কোনো গবেষণালব্ধ ফলাফল বা লেখাকে যদি নিজের লেখায় উপস্থাপন করতে হয় তবে তা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। বাক্যটি লেখার পরে বন্ধনীতে তার উৎসের নির্দেশনা দিতে হবে। কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পাঠ্য-মধ্য উদ্ধৃতি (In-text citation) এবং পৃথক রেফারেন্স তালিকায় (Reference List) ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিকতা (Ethics) মেনে চলা উচিত।

মুখ্যশব্দসমূহ (Keywords) : উদ্ধৃতি Citation), গবেষক (Researcher), গবেষণার নৈতিকতা (Research Ethics), গ্রন্থাগারিক (Librarian), প্রতিবেদন (Report), ভাষান্তর (Paraphrasing), লেখাচুরি (Plagiarism)।

১। ভূমিকা (Introduction) : লেখাচুরি (Plagiarism) গবেষণার ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা। লেখাচুরির কাজটি সম্পূর্ণভাবেই গবেষণার উদ্দেশ্য এবং নীতি বিরোধী। সময়ের সাথে সাথে এর প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ডিজিটাল বা ইন্টারনেটের যুগে মুক্ত তথ্য উৎস (Open Resource) এর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে লেখাচুরির প্রবণতা ও মাত্রা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ এক্ষেত্রে স্বত্ব সংরক্ষণ (copy-right) এর বিষয়টি খুব কঠোর হয় না।

গবেষকরা অনেক সময়ই গবেষণাপত্র লেখার জন্য বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থসমূহ থেকে বা পত্র-পত্রিকা থেকে, খবরের কাগজ বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। যখন কোনো গবেষক পূর্বের কোনো গবেষকের লেখা, ধারণা, মতামত বা বক্তব্য সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাষার তুলে ধরেন, তখন তাকে বলে উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতি ছোট হলে তবে তা গবেষণা লেখার মধ্যেই ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলে উদ্ধৃতি (citation)। কিন্তু উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলে তা নীচের স্তবকে তথ্য উৎসসহ দেখানো হয়ে থাকে,

যাকে বলে পাদটীকা (Footnote)। গবেষণার তথ্য উৎস (Source of Information) নির্দেশ করতে সাধারণতঃ দুইভাবে রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়—

i) পাঠ্য-মধ্য উদ্ধৃতি (In-text-citation) : এক্ষেত্রে গবেষণাপত্রের মধ্যেই ব্যবহৃত উদ্ধৃতি বা তথ্যের উৎসের পরিচয় বহন করে যে অংশ তাকে পাঠ্য-মধ্য উদ্ধৃতি বলে।

ii) রেফারেন্স তালিকা (Reference list) : গবেষণাপত্র লেখার কাজে ব্যবহৃত উদ্ধৃত তথ্যের উৎসসমূহ যখন গবেষক তাঁর গবেষণাপত্রের শেষে উল্লেখ করেন তখন তাকে বলে রেফারেন্স তালিকা। যা পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

২। বর্তমান সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of Present Study) : বর্তমান সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

i) লেখাচুরি (plagiarism) সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী করা,

ii) লেখাচুরির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা,

iii) লেখাচুরি প্রতিরোধ করার জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষকদের স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া।

iv) লেখাচুরির ক্ষেত্রে গবেষকদের ভূমিকা ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা।

v) লেখাচুরি বর্জনের জন্য গ্রন্থাগারিকের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা।

৩। লেখাচুরির সংজ্ঞা (Definition of Plagiarism) : খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে লেখাচুরি (plagiarism) শব্দটি ব্যবহার করা হয় অন্য গবেষকের লেখাচুরি করা বোঝাতে। লেখাচুরি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'palgarius' থেকে এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ 'অপহরণকারী'। এই সময় রোমান কবি মার্শাল অভিযোগ করেন অন্য এক কবি 'তাঁর পদগুলি অপহরণ করেছেন'। ইংরেজীতে শব্দটির ব্যবহার হয় ১৬২০ এর দশকে।

লেখাচুরি (plagiarism) বলতে বোঝায় অন্য কোনো লেখকের লেখা, ধারণা বা মতামত নিজের লেখা বলে চালিয়ে দেওয়া। আবার পুরানো কোনো ধারণাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে নিজের নামে প্রকাশ করাকেও লেখাচুরি বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সঠিক তথ্যসূত্র উৎসের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে অন্যের লেখাকে নিজ গবেষণাপত্রে ব্যবহার করাই হল লেখাচুরি। সঠিকভাবে বলা যায় লেখাচুরি হল (নাগ, ২০২২) :

i) অন্য লেখকের ধারণা বা বক্তব্য নিজের বলে উপস্থাপন করা।

ii) ধারণা, মতামত বা বক্তব্যের উৎসকে স্বীকৃতি প্রদান না করে তার ব্যবহার করা।

iii) লেখার প্রয়োজনীয় স্থানে কোটেশান চিহ্ন না দেওয়া।

iv) পুরোনো কোনো ধারণা, মতামত বা লেখাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে নিজের নামে প্রকাশ করা।

v) অসম্পূর্ণ এবং ভুল তথ্য উৎস প্রদান করা।

vi) সঠিক তথ্যসূত্রের উল্লেখ ছাড়াই হুবহু অন্য কারোর লেখা বা ধারণা বা সৃষ্টি নিজের নামে প্রকাশ করা।

vii) পূর্বে প্রকাশিত অন্যের কোনো গবেষণাপত্রকে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া।

৪। লেখাচুরির শ্রেণীবিভাগ (Types of Plagiarism) : গবেষণাপত্র লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লেখাচুরি পরিলক্ষিত হয়। ইসম (Eassom, 2016) দশ ধরনের লেখাচুরির কথা বলেছেন। যেমন—ভাষান্তর লেখাচুরি (paraphasing plagiarism), সামগ্রিক লেখাচুরি (complete plagiarism), আক্ষরিক লেখাচুরি (verbatim plagiarism), পুনরাবৃত্তিমূলক গবেষণা (Repetitive Research), নিজস্ব লেখাচুরি (Self-plagiarism), অনৈতিক সমঝোতা (Unethical Collaboration) ইত্যাদি। সিংহ ও সিংহ (Singh & Singh, 2020) আট প্রকার লেখাচুরির উল্লেখ করেছেন। যেমন—প্রত্যক্ষ লেখাচুরি (Direct plagiarism), জোড়াতালি লেখাচুরি (Mosaic plagiarism), ভাষান্তর লেখাচুরি (paraphrasing plagiarism), স্ব-লেখাচুরি (Self-plagiarism), ইচ্ছাকৃত লেখাচুরি (Intentional plagiarism), অনিচ্ছাকৃত লেখাচুরি (Unintentional plagiarism), ইত্যাদি। নাগ (2022) তাঁর ভূগোল গবেষণা এবং ক্ষেত্রে সমীক্ষা পদ্ধতি গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর লেখাচুরির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—প্রত্যক্ষ লেখাচুরি (Direct plagiarism), নিজস্ব লেখাচুরি (Self-plagiarism), জোড়াতালি লেখাচুরি (Mosaic plagiarism), আকস্মিক লেখাচুরি (Accidental plagiarism) ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের লেখাচুরির শ্রেণীবিভাগ পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেখাচুরির শ্রেণী বিভাগগুলি তুলে ধরা হল—

i) আক্ষরিক লেখাচুরি (Verbatim Plagiarism) : এক্ষেত্রে গবেষক পূর্বের প্রকাশনা থেকে এক বা একাধিক অংশকে হুবহু নকল করে নিজ লেখায় যোগ করেছেন। একে তাই copy paste plagiarism বলা হয়। এক্ষেত্রে সামান্য ভাষার বা শব্দের পরিবর্তন করে দিলে তা আবার আক্ষরিক লেখাচুরিতে পরিণত হবে।

ii) উৎস-নির্ভর লেখাচুরি (Source-based Plagiarism) : বিভিন্ন তথ্য উৎস ব্যবহারের সময় এরূপ লেখাচুরি ঘটে। এক্ষেত্রে লেখক ভুল তথ্য উৎস ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির উদ্ধৃতি (wrong citation) ব্যবহার করে থাকে। আবার লেখক যদি গৌণ উপাত্ত (Secondary data) ব্যবহার করেন কিন্তু কেবল প্রাথমিক তথ্য (primary data) উৎস ব্যবহার করেন তখন তা এই পর্যায়ভুক্ত হয়।

iii) জোড়াতালি লেখাচুরি (Mosaic plagiariam) : বিভিন্ন তথ্য উৎস থেকে হুবহু তথ্য সংগ্রহ

করে নিজের লেখায় প্রবেশ করানো হয় বলে একে patch work plagiarism বা জোড়াতালি লেখাচুরি বলে। এক্ষেত্রে কোনো লেখক কোনো উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করেই বিভিন্ন তথ্য উৎস থেকে সরাসরি কোনো লেখা বা ধারণা ব্যবহার করেন, একে হাইব্রিড লেখাচুরি (Hybrid plagiarism)ও বলে।

iv) আকস্মিক লেখাচুরি (Accidental Plagiarism) : যখন লেখক তার ব্যবহৃত তথ্য উৎসসমূহ উদ্ধৃত করতে অবহেলা করেন বা ভুল ভাবে চিহ্নিত করেন তাকে দুর্ঘটনাজনিত বা আকস্মিক লেখাচুরি বলে।

v) প্রত্যক্ষ লেখাচুরি (Direct Plagiarism) : সঠিক তথ্য সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই হুবহু অন্য কারোর লেখা নিজের নামে প্রকাশ করাকে প্রত্যক্ষ লেখাচুরি বলে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার স্বীকৃতি বা উদ্ধৃতিমূলক চিহ্ন ছাড়াই অন্যের লেখা বা লেখার অংশ নিজের লেখায় ব্যবহার করা হয়ে থাকেন।

vi) ভাষান্তর লেখাচুরি (Paraphrasing Plagiarism) : এক্ষেত্রে কোনো একজন লেখকের লেখায় সামান্য কিছু ভাষা পরিবর্তন করে লেখাটিকে নিজের বলে প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শব্দের কিছু হেরফের হয় মাত্র কিন্তু মূল ধারণা অপরিবর্তিত থাকে। এক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করা হয় না।

vii) সামগ্রিক লেখাচুরি (Complete Plagiarism) : যখন কোনো গবেষণাপত্র একজন গবেষক কর্তৃক কোথাও উপস্থাপিত হবার পর তাকে পুনরায় কেউ নিজের নামে অন্যত্র উপস্থাপন করে বা অন্যের গবেষণাপত্রকে নিজের নামে চালিয়ে দেয় তখন তাকে বলে সম্পূর্ণ লেখাচুরি।

viii) নিজস্ব লেখাচুরি (Self or Auto Plagiarism) : যখন কোনো লেখক নিজের প্রবর্তন লেখাগুলিকে একের পর এক সাম্প্রতিক লেখায় ব্যবহার করে চলেন তখন তাকে নিজস্ব লেখাচুরি বলে। কোনো লেখক নিজের পূর্ববর্তী লেখার বা লেখার অংশ বর্তমান লেখায় ব্যবহার করাকেও নিজস্ব লেখাচুরি বলে।

৫। লেখাচুরির ক্ষেত্রে গবেষকদের ভূমিকা ও কর্তব্য (Role and Responsibility of Researchers in plagiarism) : নতুন কোনো গবেষণাপত্র লেখার সময় গবেষককে পূর্বে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক গবেষণাসমূহের অধ্যয়ন বা সমীক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী প্রকাশিত লেখাপত্র পর্যালোচনা (previous literature review) করে বিশেষ কিছু ধারণা লাভ করেন যা বর্তমান গবেষণাপত্র লিখতে সাহায্য করে। তিনি অন্যের কোনো লেখা, বক্তব্য, ধারণা বা মতামতকে নিজের বলে উপস্থাপন করতে পারবেন না। তাহলে লেখাচুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পড়বেন। অন্যের ধারণা বা বক্তব্যের উৎসকে স্বীকৃতি প্রদান করে সঠিক উপায়ে লেখাচুরির দায় এড়ানো যায়। নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করে লেখাচুরি প্রতিরোধ করা যায় :

i) অন্যের কোনো লেখা থেকে কোনো বাক্য, শব্দ বা ধারণা হুবহু লেখা উচিত নয়।

ii) যে সকল উৎস থেকে লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলির বিবরণ সঠিকভাবে রেফারেন্স তালিকায় তুলে ধরতে হবে।

iii) অন্যের লেখা, ধারণা বা মতামতের উৎসকে স্বীকৃতি প্রদান করে ব্যবহার করতে হবে।

iv) গবেষণাপত্রে উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠ্য-মধ্য উদ্ধৃতি (In-text citation) এবং রেফারেন্স তালিকায় (Reference List) ব্যবহার করতে হবে।

v) যখন আমরা অন্যের লেখা, লেখার অংশ বা ধারণা বা বক্তব্য, মতামত অন্যের প্রতিবেদন বা প্রকাশনা থেকে ধার করে থাকি তখন 'উদ্ধৃতি' ব্যবহার করতে হবে এবং উদ্ধৃতি সূচক চিহ্ন দ্বারা (" ") আবদ্ধ করতে হবে।

vi) কোনো গবেষণালব্ধ ফলাফল বা লেখাকে যদি নিজের প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হয় তবে তা নিজের ভাষায় এবং তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করে উপস্থাপন করতে হবে।

vii) কোনো প্রকার স্বীকৃতি বা উদ্ধৃতিমূলক চিহ্ন ছাড়াই অন্যের লেখা, বা রচনার অংশবিশেষ নিজের গবেষণায় ব্যবহার করা যাবে না।

viii) কোনো ভুল এবং অসম্পূর্ণ তথ্য উৎস ব্যবহার করা উচিত নয়।

ix) Online-এ প্রকাশিত কোনো লেখা হলে তাদের সঠিক বিবরণের পাশাপাশি কবে পড়া হয়েছে তার তারিখ এবং রেফারেন্স তালিকায় সঠিক URL Address উল্লেখ করতে হবে।

x) বর্তমানে নানাপ্রকার লেখাচুরি যাচাই করার সফ্‌টওয়ার (plagiarism checking software) আছে, সেখানে লেখাটি প্রবেশ করিয়ে দেখে নিতে হবে লেখাচুরির অংশ শতকরা ১০ এর নীচে আছে কিনা। উক্ত সফ্‌টওয়ারগুলি হল— ithenticate, Urkund, Turnitin, plagiarism checker, plagscan, Dupli checker ইত্যাদি।

৬। লেখাচুরির প্রতিরোধে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা (Role of Librarian in Plagiarism) : লেখাচুরি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ ভূমিকা আছে। লেখাচুরি বর্জনের জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করলে গবেষকগণ স্বচ্ছ ও সঠিক থাকবে সেগুলির আয়োজন করবেন গ্রন্থাগারিক। ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ—

i) গবেষকদের মূল তথ্য উৎস (original information source) ব্যবহার করাতে উৎসাহ প্রদান করবেন গ্রন্থাগারিক।

ii) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক সততার (academic honesty) একটি নীতি প্রণয়ন করা। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

iii) লেখাচুরি কি এবং কেন হয় সেই বিষয়ের উপর সচেতনতা শিবির (awareness programme) আয়োজন করা।

iv) লেখাচুরি যাচাই সফ্‌টওয়ার (plagiarism checking software) এর উপর কর্মশালার (work-shop) ব্যবস্থা করা।

v) গবেষণার নৈতিকতা (research ethics) এর উপর সচেতনতা শিবির আয়োজন করা।

vi) রেফারেন্স লেখার প্রণালী (style of writing reference) এর উপর seminar আয়োজন করা।

vii) উত্তম গবেষণা প্রতিবেদন (Report) লেখার কাঠামো বা রীতি (format of writing a research report) নিয়ে আলোচনা সভা বা সেমিনার আয়োজন করা ইত্যাদি।

৭। উপসংহার (Conclusion) : গবেষণা নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লেখাচুরি (plagiarism)। গবেষণাপত্র লেখার ক্ষেত্রে লেখাচুরি অর্থাৎ তথ্য উৎস স্বীকার না করে কপি করা বা টুকে দেওয়া একটি ভয়াবহ রকমের অপরাধ (মুখোপাধ্যায়, ২০২১, p. 28)। গবেষণাপত্র লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ, পত্রপত্রিকা, খবরের কাগজ এবং অন্যান্য প্রকাশিত বিভিন্ন উৎস থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্থানে ঋণ স্বীকার করে নিতে হবে। প্রতিটি বাক্য নিজের ভাষায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। আর অন্যের লেখার অংশ সামগ্রিকরূপে অবিকল তখনই দেওয়া যাবে যখন সেটা উদ্ধৃতির মধ্যে থাকবে ও মূল লেখকের নাম উল্লিখিত থাকবে। আপন লেখাচুরি (Self-plagiarism) এর ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে। নিজের লেখা একের পর এক গবেষণাপত্রে ব্যবহার করা চলবে না। সুতরাং গবেষণার নৈতিকতা মেনে চলা উচিত। অন্য গবেষকের লেখা যথাযথ রেফারেন্স বা সাইটেশনসহ ব্যবহার করা উচিত। কোনো গবেষণাপত্রে অন্য লেখকের অবদান থাকলে তা স্বীকার করা উচিত।

তথ্যসূত্র (References) :

১. Eassom, H. (2016). 10 Types of plagiarism in research. Refrieved from https://hub.wiley.com/community/exchanges/discover/blog/2016/02/10 types of plagiarism-in-research.

২. মুখোপাধ্যায়, গৌতম. (২০২১). সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণা পদ্ধতি—কলকাতা : সেতু প্রকাশন।

৩. নাগ, চঞ্চল কুমার. (২০২২). ভূগোল গবেষণা এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতি—কলকাতা : নদীয়া পাবলিশার্স।

৪. Singh, R. & Singh, V. (2020). Ethical use of information in digital age : strategies to curb plagiarism. IASLIC Bulletin, 65(2), 73-83.

৫. Tunga, S.K. (2021). Plagiarism and its consequences in academic integrity : crisis and cure. Look East, 7(1), 108-117.